এফইআরবি
এর এনার্জি
নাইট
পৃষ্ঠা ৭

এনার্জি বাংলা

ঢাকা, শুক্রবার
২৪শে মাঘ ১৪২৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০
১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মূল্য ২০ টাকা
নিবন্ধন নং : ১২৯

করোনা ভাইরাস: সতর্কতা পায়রা ও বড়পুকুরিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় পটুয়াখালীর পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে বিশেষ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এই দুই স্থাপনায় অনেক চীনা নাগরিক কর্মরত। এতে বিরূপ প্রভাব পড়া শুরু করেছে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রে। নিদিষ্ট সময়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রায় তিন হাজার চীনা নাগরিক কর্মরত। তিন শতাধিক কর্মকর্তার মধ্যে প্রায় ৫০ জন বাংলাদেশে আছেন। এরমধ্যে ২৩ জনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। আর বাকী কর্মকর্তারা আটকে আছেন চীনে। এতে কাজের গতি কিছুটা কমেছে। জানুয়ারিতে চীনা নববর্ষ এবং শীতকালীন ছুটিতে গিয়ে আটকে যান কর্মকর্তারা।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ৬৬০ মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি।

বিদ্যুৎকেন্দ্র সংশ্লিষ্ঠরা জানিয়েছেন, উৎপাদনের শুরুতে বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার কথা চীনা প্রকৌশলী-কর্মীদের। যারা এখন আছেন তাদের দিয়ে সম্ভব কিনা বা বিকল্প কোন উপায় বের করা যায় কিনা তা ভাবা হচ্ছে। ধাপে ধাপে বাংলাদেশি প্রকৌশলী-কর্মীদের যুক্ত হওয়ার কথা। হঠাৎ বাংলাদেশি প্রকৌশলীরা এই কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবেন না। এখন যারা আছেন তাদের দিয়ে কেন্দ্রটি চালু যেতে পারে কিন্ত কতদিন তা চালিয়ে নেয়া যাবে তা অনিশ্চিত।

এদিকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কর্তরত পাঁচজনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এখানে প্রায় ৩০০ জন চীনা নাগরিক কর্মরত আছেন। একই সাথে পদ্মাসেতুর কাজও নিদিষ্ট সময়ে শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত চীনা কিম্বা বাংলাদেশি নাগরিকের শরীরে করোনা ভাইরাস সনাক্ত হয়নি।

ঝুঁকি এড়াতে চীনের নাগরিকদের আপাতত বাংলাদেশে আগমনী ভিসা স্থগিত রাখা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর চীন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বাংলাদেশে এসেছেন।

পেট্রোবাংলা-বাপেক্স গ্যাজপ্রম সমঝোতা : একটি পর্যালোচনা

হাসান ইফতেখার

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এখন থেকে প্রায় ১১০ বছর আগে, ১৯১০ সালে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হলেও তা একেবারেই কাড়িক্ষত লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারেনি। ১১০ বছরের হিসাব যদি না-ও ধরি, যদি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কথা বিবেচনা করি, তাহলেও যে পরিস্থিতি দেখা যায় তাও যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। কেননা, এই দীর্ঘ সময়ে দেশে তেল-গ্যাস মজুদের একটি পূর্ণাঙ্গ ঠিকুজি (রিসোর্স ম্যাপ ও রিসোর্স এস্টিমেশন) পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার প্রাথমিক ভিত্তিটাও তৈরি হয়নি।

ওই অর্ধ শতাব্দীর কথাও না হয় তুলে রাখি। তার পরিবর্তে বিবেচনায় নেই শুধু গত এক দশকের হিসাব, যে দশকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সারাবিশ্বের নজর কেড়েছে এবং প্রশংসা পেয়েছে; যে দশকে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণেরও বেশি, সেই দশক-২০০৯-১৯। এই দশকেও কি দেশের জ্বালানি সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণের কাজটি যথেষ্ট মনযোগ পেয়েছে?

একটি তথ্য এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য বোধকরি যথেষ্ট হবে। তথ্যটি হচ্ছে-বিগত ১০ বছরে দেশে মোট গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ৯ টিসিএফ। আর নতুন আবিষ্কার হয়েছে ১ টিসিএফের মতো। কিন্তু দেশি-বিদেশি অনেক বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদের মতে দেশে গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যায়নি। তাছাড়া, গ্যাসের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। তা সত্ত্বেও দেশের ক্ষেত্রগুলো থেকে গত এক দশকে গ্যাসের উৎপাদন বেড়েছে দৈনিক একশ' কোটি ঘনফুট করে। আর এর সিংহভাগ এসেছে আমেরিকান কোম্পানি শেভরন পরিচালিত বিবিয়ানা ক্ষেত্র থেকে। ২০০৯ সালে দেশের ক্ষেত্রগুলো থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলন হত এরপর পৃষ্ঠা-২

রাশিয়ার সাথে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স এর সাথে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে অতিথিরা।
ছবি- এনার্জি বাংলা

জ্বালানির দামে বৈষম্যের শিকার দুই কোটি গ্রাহক

অরুণ কর্মকার

সারাদেশে আবাসিক ও বাণিজ্যিক খাতে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপি গাস) ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জ্বালানির দামে বৈষম্যের শিকার গ্রাহকের সংখ্যা। কারণ, দেশের প্রধান প্রধান শহরভিত্তিক যেসব গ্রাহক পাইপ লাইনের গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে এলপি গ্যাস ব্যবহারকারীদের।

সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এভাবে জ্বালানির দামে বৈষম্যের শিকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের সংখ্যা এখন প্রায় দুই কোটি। এসব গ্রাহকের অধিকাংশই, বিশেষ করে আবাসিক গ্রাহক আবার পাইপ লাইনের গ্যাস ব্যবহারকারীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের। তাদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে।

তবে এই বৈষম্য নিরসনে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। একইভাবে ভোক্তাস্বার্থ নিয়ে কাজ করে যেসব বেসরকারি সংগঠন তারাও পাইপ লাইনের গ্যাস ব্যবহারকারী স্বল্পসংখ্যক, সর্বোচ্চ ৪০ লাখ শহরভিত্তিক গ্রাহকের স্বার্থ রায় যেমন উচ্চকণ্ঠ, এলপি গ্যাস ব্যবহারকারী ও বৈষম্যের শিকার বিপুল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একেবারেই তেমন নয়।

এলপি গ্যাস ব্যবসায়ীদের সূত্রগুলো জানায়, গত চার বছরে দেশে এলপি গ্যাসের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। ২০১৫ সালে দেশে এলপি গ্যাসের ব্যবহার ছিল আড়াই লাখ টনের মতো। ২০১৯ সালে তা ১০ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। এলপি গ্যাসের গ্রাহকসংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ি। সিএনজির পরিবর্তে এখন গাড়িতে এলপি গ্যাস (অটো গ্যাস) ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে বাড়ছে বৈষম্যের শিকার মানুষের সংখ্যাও।

আবাসিক গ্রাহকদের জন্য পাইপ লাইনের গ্যাস সংযোগ নিয়ে সরকারের অবস্থান কিছুটা অস্পষ্ট। কখনো বলা হচ্ছে নতুন আবাসিক সংযোগ বন্ধ। কখনো আবার সীমিত পরিসরে সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আবাসিক গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনা হচ্ছে। যে আবাসিক গ্রাহকরা এখনো মিটার পাননি তাদের দুই চুলার জন্য বিল ধার্য করা আছে মাসে ৯৭৫ টাকা। অথচ দুই চুলার যে গ্রাহক মিটার পেয়েছেন তার মাসে বিল হচ্ছে সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা। এক চুলার মিটার ছাড়া গ্রাহকের জন্য ধার্য করা বিল মাসিক ৮৫০ টাকা। অথচ মিটার পাওয়া এক চুলার গ্রাহকের মাসে বিল হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা।

অন্যদিকে, যেখানে পাইপলাইনের গ্যাস নেই সেখানে ৫ সদস্যের একটি পরিবারকে এলপি গ্যাসের জন্য মাসে ব্যয় করতে হয় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। এ কথা সত্য যে, এলপি গ্যাস প্রধানত একটি আমদানি পণ্য। তাই এর দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই এর দাম বেশি পড়ে।

তাছাড়া, দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ অফুরান নয়। বরং সীমিত। আর অফুরান হলেও ভৌগোলিক কারণে দেশের সর্বত্র, সব মানুষকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব। সে জন্য সরকার আবাসিক ব্যবহারের জন্য এলপি গ্যাসের ব্যবহার উৎসাহিত করছে। তাই সরকারের একটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে এরপর পৃষ্ঠা-২

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শুক্রবার, ২৪শে মাঘ ১৪২৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০

সম্পাদকীয়

এলপি গ্যাসের যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করতে হবে

আবাসিক ভবনে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস দেয়া বন্ধ আছে। তাই সিলিন্ডার গ্যাসের চাহিদা বেশি। প্রায় ৩০ বছর বাংলাদেশে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। গত ১০ বছর ক্রমেই এর চাহিদা বাড়ছে। নগরে বহুতল ভবনে গ্যাস ছাড়া রান্নার বিকল্প কম। বিদ্যুতের দাম বেশি। তাছাড়া রান্নার কাজে ব্যবহার করার মত বিদ্যুৎ এতদিন ছিল না। তাই এলপিজির দিকে ঝুঁকেছে মানুষ।

অল্প সময়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধির এই খাতে নিয়ন্ত্রণ আসেনি। শুধু লাইসেন্স নিয়ে অনেকটা যে যার মত বাজার তৈরি করেছে। এতে ভালো দায়িত্বশীল কোম্পানি যেমন গড়ে উঠেছে তেমনই বাজারে আছে ভূঁইফোড় কোম্পানিও। জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে নিম্নমানের পণ্য নিতে।

এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, প্রায় প্রতিদিন দেশের কোন না কোন স্থানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই ভয়াবহ অবস্থা নিরসনে কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। কারো কোন নজর দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছে মতো চলছে।

দুর্ঘটনার সব দোষ শেষ পর্যন্ত গ্রাহকের ঘাড়ে দেয়া হচ্ছে। যে সে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারছে না অসতর্কতার কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে বলেই বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে যে নিম্নমানের বোতল এবং নিম্নমানের ফিটিংসের বিষয়ও জড়িত সে বিষয়টা কোনোভাবেই সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জোরেশোরে উল্লেখ করছেন না।

এই মৃত্যুর মিছিল থামাতে যে যথাযথ উদ্যোগের প্রয়োজন, যে যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, তার কোনটাই করা হচ্ছে না।

যেসব কোম্পানি বোতলে সিলিন্ডার গ্যাস প্রক্রিয়া করে ভরছেন তাদেরই অনেকে আবার বোতল তৈরি করছেন। অনেক নিম্নমানের কোম্পানিও এই কাজ করছে। যোগ্যতা নির্ণয় না করে এভাবে বোতল তৈরির সুযোগ দেয়ার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে।

আর পাঁচটা পণ্যের মত সাধারণ দোকানে বিক্রি হচ্ছে। সব সময় ঝুঁকি নিয়ে চলতে হচ্ছে।

স্পর্শকাতর দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্য হলেও এ নিয়ে তেমন কোনো সচেতনতা বা সরকারের নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেমন দেখা যায়নি এর নিরাপত্তা নিয়ে, তেমন দেখা যায়নি এর দাম নিয়ন্ত্রণেও।

এলপি গ্যাসের দাম আর নিরাপত্তা দুটোতেই অভিযোগ আছে। অথচ উদ্যোক্তরা শুধু গ্রাহকের সচেতনতার দোহায় দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে মৃত্যু থামছেই না।

অথচ এলপি গ্যাস সুন্দরভাবে মানুষের আস্থায় আনা সম্ভব ছিল। নিরাপত্তার সাথে সাথে এর দামও নিয়ন্ত্রণ দরকার।

দীর্ঘ দিনেও এলপি গ্যাসের দাম নিয়ন্ত্রণে কোন নীতি করতে পারেনি সরকার। শুধু আশ্বাস দিয়েই দিন পার করেছে। কিন্তু কেন নিয়ম করা গেল না।

সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখতে হবে এটা অনেক আগের নির্দেশ। বিইআরসি ২০০৯ সালে এমন এক আদেশ দিয়েছিল। আদালত সম্প্রতি নতুন আদেশ দিয়েছে পহেলা মার্চের মধ্যে সব সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখতে। এমন নির্দেশনা আদালত থেকে আগেও একবার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন সেটা করা হয়নি। এখনো হবে কি-না তা অনিশ্চিত। আদালতের এই আদেশ ইতিমধ্যে প্রায় ১০ দিন পার হয়েছে। কিন্তু কোন কোম্পানি তাদের সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখেছে তা দেখা যায় নি।

এর দাম মান আর নিরাপত্তা কবে নিশ্চিত হবে তা এখনও অনিশ্চিত। উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত। নিরাপত্তা, মান এবং দাম যথাযথ হলে, এমন একটি আবশ্যকীয় পণ্যে মানুষের আস্থা থাকলে- এর বাজারও বাড়বে। বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয় হওয়া এই পণ্যে শুধু সরকারের নয় উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদেরও নিজস্ব দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে সচ্ছতার সাথে এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ করতে হবে। আর সাথে বাজারে আনতে হবে সুস্থ প্রতিযোগিতা।

জ্বালানির দামে বৈষম্যের শিকার দুই কোটি গ্রাহক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে পাইপ লাইনের গ্যাস ব্যবহারকারীদের সঙ্গে এলপি গ্যাস ব্যবহারকারীদের ব্যয়ে যে বিপুল ব্যবধান তা কমিয়ে আনা। সে ক্ষেত্রে সরকার এলপি গ্যাস ও এর চুলা-সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক ও কর রহিত করে দিতে পারে। সর্বোপরি সরকার এলপি গ্যাস ব্যবহারারীদের জন্য কিছু ভর্তুকির সংস্থান করতে পারে। অবশ্য সরকার এ ত্রে ভর্তুকির মধ্যে না গিয়ে বিষয়টি বাজারের ওপরই ছেড়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছে। সেত্রে পাইপ লাইনের গ্যাস ও এলপি গ্যাস ব্যবহারকারীদের মধ্যে দামের বিপুল বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য অন্য কোনো কার্যকর পন্থা অনুসরণের কথা ভাবতে হবে।

গ্যাস ছাড়া, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। বর্তমানে দেশের প্রায় আড়াই কোটি গ্রাহক ৬টি প্রথক বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। এদের ত্রে প্রতি ইউনিট (এক কিলোওয়াট ঘণ্টা) বিদ্যুতের সর্বোচ্চ গড় দাম ৮ টাকার মতো। অথচ যেসব গ্রাহক মিনি গ্রিডের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা।

আবার যারা বাড়িভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ (সোলার হোম সিস্টেম) ব্যবহার করছেন, তাদের ত্রে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ছে প্রায় ৭২ টাকা। এই বৈষম্য নিরসনও সরকারের ভাবনার জরুরি বিষয়। কারণ, দেশের সংবিধান নাগরিকদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য অনুমোদন করে না।

পেট্রোবাংলা-বাপেক্স-গ্যাজপ্রম সমঝোতা : একটি পর্যালোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৭৫ কোটি ঘনফুটের মতো। এখন হচ্ছে প্রায় ২৭৫ কোটি ঘনফুট।

দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র ভোলা ছাড়া প্রতিটিতে গ্যাসের চাপ কমছে। উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য কম্প্রেসর বসানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত এক দশকে নতুন যে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ভোলা উত্তর ছাড়া অন্যগুলো এতই ছোট ও কম মজুদের যে সেগুলো আলাদা গ্যাসক্ষেত্রের মর্যাদাই পেতে পারে না। যেমন, ঢাকার পাশের রূপগঞ্জ, নোয়াখালীর সুন্দলপুর প্রভৃতি।

স্থলভাগের মতো সমুদ্রবক্ষের চিত্রও করুন। মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার পর এখনো কাজ তেমন কিছুই হয়নি। দেশের সমুদ্রসীমায় ২৬টি ব্লকের মধ্যে বর্তমানে ৪টিতে পিএসসির অধীনে ৫টি বিদেশি কোম্পানি কাজ করছে। ব্লকগুলোর মধ্যে তিনটি অগভীর ও একটি গভীর সমুদ্রের। এর মধ্যে অগভীর সমুদ্রের একটি (ওএনজিসির সঙ্গে পিএসসিভুক্ত এসএস-৪) ছাড়া আর কোনোটি থেকে দু-চার বছরে কোনো সুখবরের সম্ভাবনা নেই। ধারাবাহিকভাবে এই অবস্থা চলে আসায় জ্বালানি খাত এখন প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি নির্ভরতার পথে।

কেন এই অবস্থা? এই প্রশ্নের সবচেয়ে মুখরোচক ও জনপ্রিয় জবাব হলো- সরকার দেশের নিজস্ব জ্বালানিসম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেয়নি। এই কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশীয় কোম্পানিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়নি। বক্তৃতা-বিবৃতিতে এসব কথা হামেশাই বলা হয়। এর মধ্যে সত্যতাও আছে। কারণ দায়িত্বটা প্রধানত সরকারেরই।

দেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য গ্যাসপ্রমের সাথে যে সমঝোতা এবং তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত চুক্তি অনেক আগেই হওয়া দরকার ছিল। সেটা হলে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্সের কারিগরি ও আর্থিক ক্ষমতায়ন হত। দেশে তেল-গ্যাসের অনুসন্ধান ও উত্তোলন বাড়তো। জ্বালানি খাত ক্রমাগতভাবে আমদানিনির্ভরতার পথে যেত না।

এই বিবেচনা সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে ছিল। এ নিয়ে কাজও হয়েছে। তাই কখনো গ্যাজপ্রম, কখনো ভারতের ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড, কখনো বা আমেরিকান কনোকোফিলিপস, আবার কখনো চীনের সিনোপেকের সঙ্গেও বাপেক্সের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং যৌথ উদ্যোগে কাজ করার বিষয়ে আলোচনার কথা শোনা গেছে; কিন্তু দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় হলেও বিষয়টি দানা বাঁধছিল না। শেষ পর্যন্ত বিলম্বে হলেও, গত ২৮শে জানুয়ারি রাশিয়ার গ্যাজপ্রমের সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক সই হলো।

দুটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। কোনো চুক্তি নয়। কী সেই সমঝোতা সেটা দেখা যাক। প্রথম সমঝোতা পেট্রোবাংলা ও গ্যাজপ্রমের মধ্যে। বিষয় কৌশলগত অংশীদারিত্ব। এর আওতায় দেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নে দুই পক্ষ যেসব বিষয়ে একমত হবেন তার সবকিছুই করতে পারবে। দেশের স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রবক্ষেও, যে কোনো ভূ-কাঠামোয় অনুসন্ধান, কূপ খনন, রিসোর্স ম্যাপিং, রিসোর্স এস্টিমেশন, পাইপ লাইন নির্মাণ প্রভৃতি সব বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান এর আওতাধীন। এই কাজের জন্য পেট্রোবাংলার চাহিদার ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে গ্যাজপ্রম বিনিয়োগও করবে। এসব কাজে বাপেক্স হবে গ্যাজপ্রমের অংশীদার।

দ্বিতীয় সমঝোতাটি হয়েছে বাপেক্স ও গ্যাজপ্রমের মধ্যে। বিষয়-ভোলা দ্বীপসহ দক্ষিণাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পাইপলাইন স্থাপন প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভোলার শাহবাজপুরে দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপের মাধ্যমে গ্যাসের অবকাঠামো চিহ্নিত করে পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি, ১৯৫২ সালে। ১৯৭৪-৭৫ সালে আরকো-প্রাকলা সেইসমস সেখানে পুনরায় দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ চালিয়ে গ্যাসের অবস্থান নিশ্চিত করে। এরপর ১৯৯৫-৯৬ সালে বাপেক্স ওই ভূ-কাঠামোয় কূপ খনন করে গ্যাস পায়। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত ভোলা দ্বীপে অনুসন্ধানের আওতায় এসেছে মাত্র ৪০ বর্গকিলোমিটার। আর বাপেক্স ও গ্যাজপ্রমের মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে তার মাধ্যমে অনুসন্ধানের আওতায় আসবে এক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা। এতে সমগ্র ভোলা দ্বীপ ছাড়াও মনপুরাসহ আশেপাশের দ্বীপাঞ্চল এবং মেঘনা নদীবক্ষ পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উন্নয়নের আওতায় আসবে। ভোলা দ্বীপের যে ৪০ বর্গকিলোমিটার একটি কিংবা মতান্তরে দুটি আলাদা গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেই এলাকাটি গ্যাজপ্রমের সঙ্গে বাপেক্সের সমঝোতার বাইরে রাখা উচিত। সেটির সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাপেক্সের একক সক্ষমতার ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ওই অঞ্চলে গ্যাসের অবকাঠামোর বিস্তার নির্ণয়ের জন্য সেখানে নতুন কূপ খনন করতে হতে পারে। সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে বাপেক্স এ সব বিষয় চূড়ান্ত করুক।

বাপেক্স-গ্যাজপ্রম যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে তার আওতায় বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে উপকূলীয় সম্ভাব্য এলাকা হয়ে ভোলা দ্বীপসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান হোক এটা আমাদের চাওয়া। বেঙ্গল বেসিনভূক্ত ওই এলাকা তেল-গ্যাসের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। কিন্তু এখন পর্যন্ত অবহেলিত। সেই অবহেলার অবসান হলে দেশ নতুন সমৃদ্ধির মুখ দেখবে।

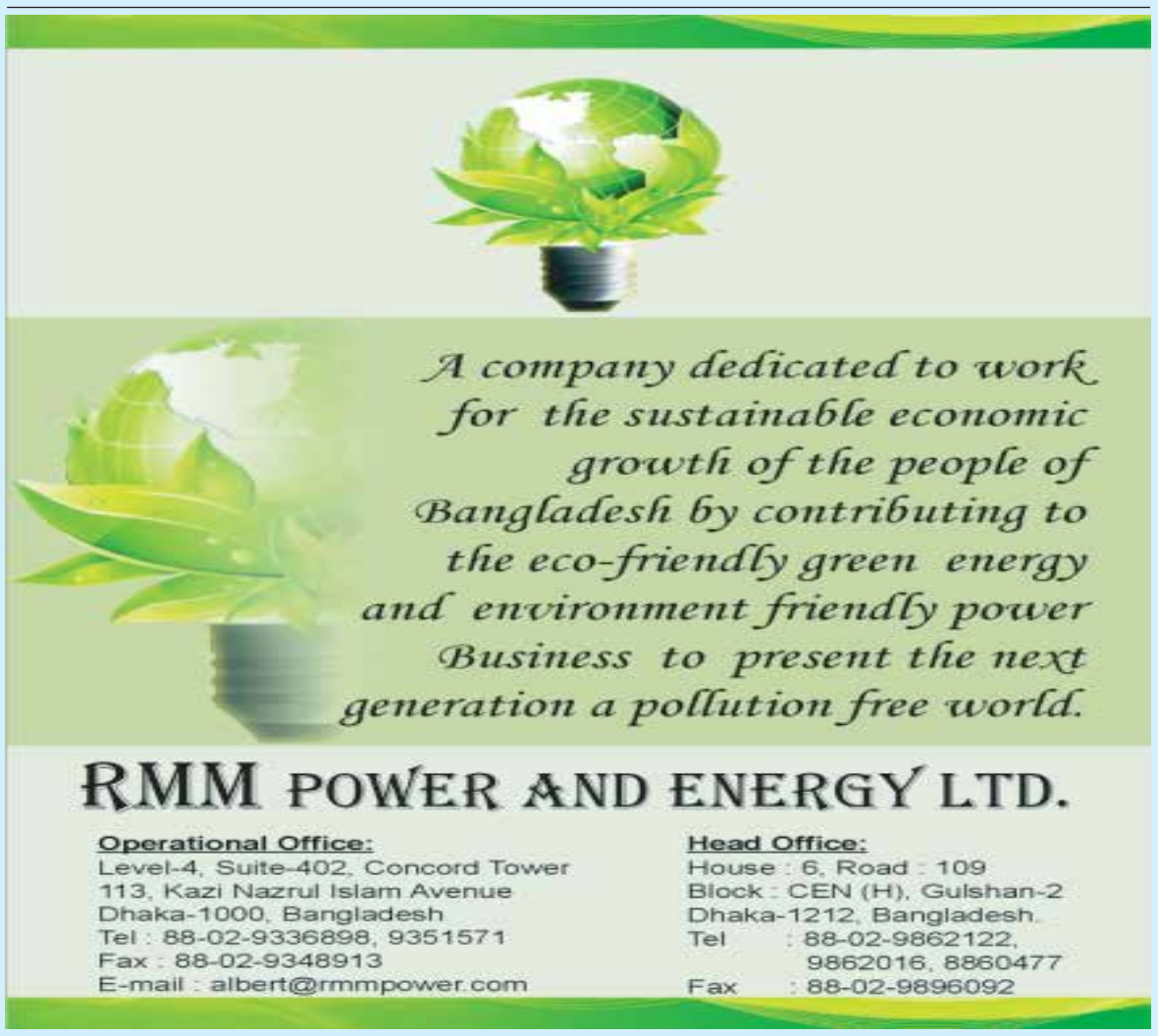

এক দশকেও দাম নির্ধারণে নীতি হয়নি : শুধু আশ্বাস

বিশেষ প্রতিনিধি

তরলী প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলপিজি) দাম নিয়ন্ত্রণে বাস্তবে কোনো উদ্যোগ নেই। যখনই দাম বাড়ে অথবা কোনোভাবে দামের প্রসঙ্গ আসে তখনই সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার একইভাবে চলতে থাকে। এ অবস্থা চলছে প্রায় এক দশক ধরে।

এই সময়ে এলপিজি বটলিং নীতিমালাসহ ব্যবসাসংক্রান্ত কয়েকটি নীতি-বিধি হয়েছি। কিন্তু দাম নির্ধারণের নীতিমালা হয়নি।

সরকার নিয়মিত দাম নির্ধারণ করে দেবে বলে একাধিক কমিটি হয়েছে। কমিটির বৈঠক হয়েছে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব সরকারের উর্ধ্বতন কর্তারা বরাবরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যখনই এ বিষয়ে কথা বলেছেন, দ্রুত সময়ে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নীতি হবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

নীতি না থাকায় ভোক্তা সব সময় উচ্চমূল্যে এলপি কিনছে বলে বরাবর অভিযোগ আছে। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দরে কিনতে হচ্ছে।

এখন থেকে পাঁচ বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে এলপি গ্যাসের দাম ঠিক করতে নীতি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কমিটি করা হয়। সে কমিটি নীতির খসড়াও করে। কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন হয়নি।

পাইপ লাইনের পাশাপাশি এলপি গ্যাস জনপ্রিয় করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর উচ্চমূল্য অন্যতম বাধা বলে সে সময় এক কমিটি জানায়। পরে নীতি করার কমিটি গঠন করা হয়।

দু'বছর আগে ২০১৮ সালে তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেসা বেগমের সভাপতিত্বে এলপি গ্যাসের দাম নিয়ে বৈঠক হয়। সে বৈঠকে সরকারি কোম্পানির জন্য সাড়ে ১২ কেজি এলপি গ্যাসের দাম ৭০৩ টাকা আর বেসরকারি কোম্পানির জন্য ৭৩০

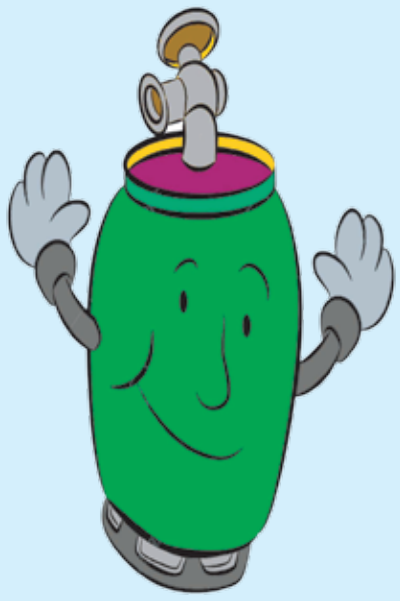

টাকা নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা সিলিন্ডারে খুচরা দাম লিখে দেওয়ার সুপারিশ করে।

জ্বালানি বিভাগ সূত্র জানায়, বেসরকারি কিছু কোম্পানির বিরোধিতার কারণে স্থায়ী নীতি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। এভাবে বিভিন্ন সময়ে জ্বালানি বিভাগ থেকে এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কখনো কোনো দিন সে দামে বাজারে কোনো কোম্পানির সিলিন্ডার বিক্রি হওয়ার নজির দেখা যায়নি।

এলপি গ্যাস ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তেলের দামের সাথে এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ হয়। এ জন্য সব সময় একই দামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কেনা সম্ভব হয় না। তাই দাম নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সম্প্রতি বলেছেন, ভোক্তা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণের জন্য একটি প্রাইজিং ফর্মুলা থাকা উচিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার কারণে ভোক্তারা যাতে সহজে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাস পায়, সে লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে এলপি গ্যাসের বাজার উন্মুক্ত করা হয়েছে। দ্রুত সময়ে এই নীতি চূড়ান্ত হবে বলে জানান তিনি।

আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রায় দাম নির্ধারণ করতে। আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মিল করে প্রতিমাসে দাম ঠিক করে ভারত। এতে সেখানে কোন মাসে বাড়ে, কোন মাসে কমে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূল্য নির্ধারণী নীতিমালা না থাকায় সুযোগ পেলেই কোম্পানিগুলো এলপিজির দাম বাড়ায়। বিশেষ করে পাইপলাইনের গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হলে এলপিজিরও দাম বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে এলপি গ্যাসের চাহিদা বছরে তিন লাখ টন। ২০১৫ সালে দেশে মোট এলপি গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ ছিল দুই লাখ টন। তবে জ্বালানি বিভাগ বলছে, প্রকৃতপক্ষে এলপি গ্যাসের চাহিদা প্রায় দশ লাখ টন। এলপি গ্যাসের চাহিদার মাত্র ৮ শতাংশ জোগান দেয় বিপিসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস লিমিটেড। সরকারি এ প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ১২ কেজি ওজনের প্রতি সিলিন্ডার এলপি গ্যাসের মূল্য ৭০০ টাকা। ২০০৯ সাল থেকে এ দামেই এলপি গ্যাস বিক্রি করছে তারা। তবে এলপি গ্যাসের চাহিদার ৯২ শতাংশই জোগান দিচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। বর্তমানে প্রায় ২০টি বেসরকারি এলপি গ্যাস কোম্পানি রয়েছে।

কোম্পানিগুলো অনেকটা নিজেদের মতো করে এ পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। প্রতিটি কোম্পানির বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) লাইসেন্স নেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে তারা কোনো নীতিমালার আওতাভুক্ত নয়। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে মূল্য বাড়িয়েছে বেসরকারি কোম্পানিগুলো। তাই নীতিমালা খুব জরুরি। নীতি থাকলে গ্রাহক এবং উদ্যোক্তা উভয়ের সুবিধা। বাজার অস্থিরতা কমবে। ভোক্তার আগ্রহ বাড়বে।

সিলিন্ডার: দুর্ঘটনা থামছে না

নতুন অনেকভবনে এভাবেই নিচতলায় সিলিন্ডার রেখে পাইপ দিয়ে গ্যাস তুলে রান্না করা হচ্ছে। রাজধানীর একটি ভবন থেকে তোলা। ছবি: এনার্জি বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনা থামছেই না। এ নিয়ে যেন কারও কোন মাথা ব্যাথা নেই। এখন পর্যন্ত সিলিন্ডার বিস্ফোরণের বিস্তারিত নিয়ে পর্যালোচনা হয়নি। এর জন্য দায়ি কে তাও কখনও জানা যায়নি।

রাজধানীতে নতুন এক ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে নতুন বহুতল ভবনে। যে ভবনে পাইপের গ্যাস নেই এমন নতুন বহুতল ভবনের নিচতলায় গ্যাস সিলিন্ডার রেখে পাইপের মাধ্যমে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। সাধারণ পাইপ দিয়েই এই গ্যাস নিচতলা থেকে উপরে নেয়া হচ্ছে। এটাও কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে না। বড় ধরণের ঝুঁকি নিয়েই এভাবে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন ভবনে গ্যাস সরবরাহ করতে দেখা গেছে। এধরণের এক ভবন মালিক বলছেন, ঘরের মধ্যে সিলিন্ডার রাখতে অনেকে ভয় পান। সে জন্যই এব্যবস্থা। এছাড়া খোলা ট্রাকে, রিক্সায়, ভ্যানে কাঁত করে ঝুঁকি নিয়ে সিলিন্ডার পরিবহন করার দৃশ্য সব সময় দেখা যায়।

গত এক দশকে সারাদেশে গ্যাস বিস্ফোরণে কমপক্ষে পাঁচশ' জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কয়েক হাজার। চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত নিহত হয়েছেন শতাধিক, আহত প্রায় দুইশ' জন।

ফায়ার সার্ভিস, তিতাস গ্যাস, বিস্ফোরক পরিদপ্তর সূত্রে এতথ্য জানা গেছে।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ২০১৫ সালে ৮০টি, ২০১৬ সালে ১৩১টি এবং ২০১৭ সালে ৭৯টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত ১০ বছরে ছোট-বড় প্রায় ১০ হাজার অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৭ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১ হাজার ৫৯০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৬-১৭ সালে চুলা থেকে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে ২৩৮টি। আর এ সময় গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটেছে পাঁচ হাজার ৬৫০টি।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আগুনের তীব্রতা বেশি। এতে বিষাক্ত ভারি ধোঁয়ায় শ্বাসনালি ও ফুসফুস পুড়ে যায়। রাজধানী ঢাকার ৬৫ শতাংশ বেশি মানুষ বাসে চলাচল করে। এসব বাসের ৯০ শতাংশ আবার সিএনজিচালিত। সিএনজিচালিত ৪৪ শতাংশ বাসের গ্যাস সিলিন্ডার মেয়াদোত্তীর্ণ। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার নিয়ে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন চলাচল করছে। বাস ছাড়াও ৩৬ শতাংশ ট্রাক ও ৯ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশার সিলিন্ডারের মেয়াদ শেষ। বছরে অন্তত দেড়শ' গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। গাড়িতে সিএনজি ব্যবহারে মাসে প্রায় ১ হাজার ৪৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হলেও ব্যবহারকারীদের অসচেতনতায় নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানো যাচ্ছে না। প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডার ৫ বছর পরপর পরীক্ষা করানো বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু তা হচ্ছে না।

দেশে মোট আমদানি করা এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা ৩৯ লাখ ৬৪ হাজার ৭২৮টি। আর দেশে তৈরি অনুমতিপ্রাপ্ত বাজারজাতকৃত সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ লাখ ৪ হাজার ৩৪৫। এসব সিলিন্ডার পুনঃপরীার পর্যাপ্ত সুবিধা নেই।

সিলিন্ডারের মান নিয়ন্ত্রণে সরকারি-বেসরকারি যেসব সংস্থা কাজ করছে, এ ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি সক্ষমতা নেই। দেশে ৪টি এলপিজি তৈরির কারখানা ও ১৫টি পুনঃপরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শুক্রবার, ২৪শে মাঘ ১৪২৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০

এলপিজি কী? প্রোপেন, মিথেন, বিউটেন, ইথাইন, পানি, হেক্সেন, ইথেন ও প্রোপিন গ্যাস এর মিশ্রণের তরলীকৃত রূপ। ইথাইন মারক্যাফট্যান নামক একটি তীব্র গন্ধ যুক্ত গ্যাস। যা আমারা সিলিন্ডার লিক করলে বুঝতে পারি।

গণশুনারি মাধ্যমে এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ করতে হবে

অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম

> “দাম বাড়ানোর আগে পর্যালোচনা করতে হবে, কখন পণ্য আমদানি করা হয়েছে। তখন তার দাম কত ছিল। আর বিক্রিই বা কত দিয়ে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেই যে এখানে বাড়াতে হবে, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় আগে থেকে আমদানি করে রাখা পণ্য বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। শুধু দাম নয় নিম্নমানের এলপি বিক্রিও বন্ধ করতে হবে।”

আইন অনুযায়ী সমস্ত পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের একক এখতিয়ার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি)। ২০০৩ সালের ধারা (২) এবং ২২ এর (২) অনুযায়ী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বিইআরসির লাইসেন্সি। কিন্তু সে আইনের কোন প্রয়োগ নেই। চোখের সামনে দিনের পর দিন গ্রাহকের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে।

বিপিসি ২০০৯ সালের ৯ই জুন আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের ভিত্তিতে সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডার ৮৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭৫০ টাকা করে। এখনো সেটা বলবত আছে। বিইআরসি'র এই আইন ২০০৯ সালে করা হয়। ওই আদেশে একথা বলা হয়, বিপিসি, বিইআরসির অনুমতি ছাড়া দাম বাড়াতে পারবে না। অমোছনীয় কালিতে প্রত্যেক সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখতে হবে। তিন মাসের মধ্যে এটা কার্যকর করতে হবে। এর আগে ওই বছরের মার্চ মাসে আর এক আদেশে বলা হয়, খুচরা মূল্য এক হাজার টাকা থেকে ৮৫০ টাকা করতে হবে। একই সাথে ফার্নেস অয়েল ৩০ টাকা থেকে কমিয়ে ২৬ টাকা করা হয়। ১৫ই মার্চ ২০১৯ থেকে তা কার্যকর করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন ডিজেলের মূল্য অস্বাভাবিক কমে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় বিইআরসি দাম নির্ধারণ করা সত্ত্বেও সে দাম কার্যকর করেনি বিপিসি। আবার যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক দাম কমে গেল তখন মূল্য হার পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করেনি।

বিইআরসির কাছে না এসে, গণশুনানি না করে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে জ্বালানি বিভাগের নির্বাহী আদেশে। যখন দরপতন হয় তখন বিইআরসিতে আসেনি। প্রস্তাব দেয়নি। পরে নামমাত্র দাম সমন্বয় করেছে। তবে ডিজেলের করেনি। ডিজেলের দামে পরিবহন মালিকদের সুবিধা দেয়া হয়েছে। লাভের অংশ পরিবহন মালিকরা পেয়েছেন। সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি বিদ্যুৎ মালিকদের। অথচ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে সেই কমদামের ডিজেলের সুবিধা দেওয়া হয়নি। এতে বঞ্চিত হয়েছে শুধু সাধারণ মানুষ। একইভাবে এলপি গ্যাসের ক্ষেত্রেও করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও দাম নিয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহক। যে দাম দিয়ে তারা এলপি গ্যাস ব্যবহার করছেন তা যৌক্তিক নয়।

বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে এলপিজির ব্যবহার বাড়তে থাকে। পরিকল্পিতভাবে তীব্র সংকট তৈরি করে এই ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। বাসাবাড়িতে সংকট তৈরি করা হয়েছে। সিএনজিতে তীব্র সংকট তৈরি করা হয়েছে। বিকল্প বাজার হিসেবে এলপিজি সেই সংকট মিটিয়েছে। সংকট তৈরি করে বাসাবাড়িতে এলপিজি ঢুকানো হয়েছে। আর সেই সুযোগে দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। একদিকে সিএনজির মূল্য বৃদ্ধি করে পরিবহনে সুবিধা দেয়া হচ্ছে

অন্যদিকে গ্যাস সংকট এলপিজি ব্যবহারে বাধ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি বিইআরসিকে এই দাম নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে এলপিজির দাম দফায় দফায় শুধুই বেড়েছে। স্থান ভেদে বাসাবাড়িতে ১ হাজার থেকে বারোশ' টাকা সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে। কিছুদিন আগেও নতুন করে ১০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এর আগে এলএনজি আমদানির সাথে মূল্য সমন্বয় করার কথা বলে পাইপলাইনের গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়।

পাইপলাইনের গ্যাসের দাম বাড়ানোর সময় এলপিজির দামও বাড়ানো হয়। অথচ এলএনজি আমদানির সঙ্গে এলপি গ্যাসের দামের কোনো সম্পর্ক নেই। এখন আন্তর্জাতিক বাজারের কথা বলে আবার এলপি গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে যদি দেখি, সেখানে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর যে পরিকল্পনা তার জন্য এলপিজিতে ভর্তুকি দেয়া হয়। আমাদের এখানে ভর্তূকি তো দূরে থাক ন্যায্য দাম টুকু দিয়েও কিনতে পারছেন না। এটা দেশের, রাষ্ট্রের, নীতি হতে পারে না। এটা ভয়ংকর অপরাধ।

দাম বাড়ানোর আগে পর্যালোচনা করতে হবে, কখন পণ্য আমদানি করা হয়েছে। তখন তার দাম কত ছিল। আর বিক্রিই বা কত দিয়ে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেই যে এখানে বাড়াতে হবে, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় আগে থেকে আমদানি করে রাখা পণ্য বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। শুধু দাম নয় নিম্নমানের এলপি বিক্রিও বন্ধ করতে হবে। এতে ভোক্তারা ঠকছে। ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় চারদিক দিয়ে বাড়ছে। কিন্তু কোন নিয়ন্ত্রন নেই। নিত্য পণ্যের অন্যতম একটি জ্বালানি। আর জ্বালানির মধ্যে এলপি গ্যাস এখন অনেকের জন্য অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। গতবছর বাসাবাড়িতে গ্যাসের চুলার ব্যয় বেড়েছে ২১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আর যারা এলপি গ্যাস ব্যবহার করেন তাদের খরচ আরও বেড়েছে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি।

আর এটা সম্ভব গণশুনানির মাধ্যমে। যদি বিইআরসির মাধ্যমে গণশুনানি করে এলপিজির দাম নির্ধারণ করা হয় তবে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করেই দাম নির্ধারণ সম্ভব হবে।

তাই জ্বালানি বিভাগের উচিৎ দ্রুত নিয়ম করে গণশুনানির মাধ্যমে এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া ঠিক করা। তবেই ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত হবে।

অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম
ডিন, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

এলপিজি ব্যবসায়ের ডিজিটাল যাত্রা

প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম

একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা সহজ করছে। এরই সাথে শুরু হয়ে গেল এলপিজি ব্যবসার ডিজিটাল যাত্রাও। এখন থেকে এলপিজি ব্যবসাতে নিয়োজিত সব কোম্পানি একটি সেন্ট্রালাইজড ইআরপি সফট ওয়ারের মাধ্যমে ডিজিটালি সমন্বিতভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানিগুলো মূলত কিছু অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলো। কিন্তু এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়াতে কিছুতেই ইনভেন্টরি এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজ একটি ইআরপি সফটওয়ার দিয়ে করা যাচ্ছিল না। অ্যাডভান্সড ইক্যুইপমেন্ট লিমিটেড এনেছে নতুন সফটওয়ার (www.amarbebsha.com) যেখান থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সফটওয়্যার পছন্দ করে ব্যবসা পরিচালনা করার কাজে ব্যবহার করা।

এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর, ডিলার, স্যাটেলাইট কোম্পানি কিংবা আমদানিকারক– যেই হোক না কেন– এখন খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে পারবে সফটওয়্যার দিয়ে।

ব্যবসা সহজীকরণে বর্তমান সময়ে ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার খরচ কমে, স্বল্প সময়ে নির্ভুল ভাবে হিসাব সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা যায়, লেনদেনের সঠিক হিসাব রাখাসহ ব্যবসার লাভ-ক্ষতি জানা এমনকি যে কোনো জায়গায় বসে ব্যবসার অবস্থা জানা যায়।

গতানুগতিক/প্রচলিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে এলপিজি ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক হিসাব রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেক ক্ষেত্রে।

ব্যবসা এলপিজি সফটওয়্যার শুধু এলপিজি ব্যবসায়ীদের জন্য বানানো কাস্টমাইজড ইআরপি সফটওয়্যার, তাই এলপিজি ব্যবসায়ীরা হিসাব রাখতে পারবে খুব সহজেই।

ব্যবসা এলপিজি ইআরপি যাত্রা শুরুর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত যারা ব্যবহার করছেন তারা সন্তোষজনক ভাবে তাদের ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

ঢাকার এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর সোনারগাঁ ট্রেডার্সের সাহাবুদ্দিন বলেন, প্রায় ৩০ বছর এলপিজি ব্যবসায় করে আসছি। ই.আর.পি সফটওয়্যার ব্যবহার করার পর বুঝলাম এটা খুব উপকারি। চট্টগ্রামের এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর এস আলম ট্রেডার্সের সাইফুল আলম বলেন, খাতার পর খাতা এবং কম্পিউটার দুটোই আছে। ছিলনা শুধু সমাধান। নতুন সফটওয়্যার ব্যবসায় সহজ করেছে।

পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক এলপিজি ব্যবসা জগতে নিজে কে টিকিয়ে রেখে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা সঞ্চালন করতে গিয়ে ডিস্ট্রিবিউটরদের নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।

উপরন্তু পাওনা সিলিন্ডারের পরিমাণ, বকেয়া পাওনার হিসাব, ব্র্যান্ড ও ননব্র্যান্ড অনুযায়ী সিলিন্ডারের আলাদা হিসাব সংরক্ষণের জটিলতা তো রয়েছেই।

তাই বিশ্বব্যাপী এলপিজি ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসার হিসাব রাখতে ব্যবহার করছে এলপিজি ইআরপি। এতে করে নির্ভুল হিসাব রাখার পাশাপাশি বেঁচে যাচ্ছে সময় এবং খরচ।

উপরন্তু এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিকভাবে ভ্যাট ও ট্যাক্সের হিসাব সংরক্ষণ করা যায়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে হিসাব রাখা শুরু করলেই এলপিজি ব্যবসায়ীরা সঠিকভাবে ভ্যাট ও ট্যাক্সের হিসাব জানতে পারবে এবং সঠিক পরিমাণ অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা দিতে পারবে।

এলপিজি বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে জানা গেছে এই ব্যবসায়ে ডিজিটালকরণে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করতে পারে গ্যাস সিলিন্ডারের হোমডেলিভারি সার্ভিস। তারা আরো জানান, গ্রাহক পর্যায়েও অনলাইনভিত্তিক বা অ্যাপভিত্তিক গ্যাস ক্রয়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

গ্রাহক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাথায় রেখে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তিখাত সফটওয়্যার উন্নয়নে কাজ করছে। যা প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বোপরি ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলতে প্রয়োজন যথাযথ রিকল্পনা প্রণয়ন। আর রিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নই পারে এলপিজির ডিজিটাল যাত্রায় নতুন দ্বার উন্মোচন করতে।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম
জ্বালানি বিশেষজ্ঞ

এলপিজি: একটি পর্যালোচনা

১০ বছরে বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ বাজার দখল করবে এলপিজি

শেখ নাওইদ রশিদ

বাংলাদেশের একটি এলপিজি বটলিং কারখানা

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে আসছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য দেশে এখন এক সম্ভাবনাময় খাত এলপি গ্যাস। গ্রাম এবং শহরে পাল্লা দিয়ে রান্নার কাজে কিংবা পরিবহন খাতে বাড়ছে এলপিজির ব্যবহার। এলপিজির সম্ভাবনা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তাহলে শুরুতেই বলতে হয় দেশের সার্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে।

বর্তমানে ব্যবসার পরিবেশকে ভালো বলব। কারণ কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। এখন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। গত পাঁচ-ছয় বছর যদি পর্যালোচনা করায় যায় দেখা যাবে, উদ্যোক্তরা নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ করছেন। আরও করবেন। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উদ্যোক্তারাও তাদের বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন। দেশে অনেক বড় বড় প্রকল্প হচ্ছে। সড়কের কাজ হচ্ছে, ব্রিজের কাজ হচ্ছে। এতে আমাদের ইস্পাত এবং সিমেন্ট খাতের চাহিদা বাড়ছে। আবাসন খাত এগোচ্ছে। এলএনজি আমদানি হচ্ছে। সরকারের প্রত্যেক প্রকল্পেই দেশের উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ সবাই সুবিধাভোগী। আগে 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে' বাংলাদেশের নাম কখনো উচ্চারণ হতো না। এখন আমরা তাদের আলোচনায় আছি। বিশ্বের যত প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) তারা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইতিবাচক কথা বলছে। আমি মনে করি, দেশের শিল্পকে, ব্যবসায়কে এদেশের উদ্যোক্তারাই এগিয়ে নিচ্ছেন, বিদেদেশিরা নয়।

এবার আসি এলপিজি শিল্পে। এলপিজির চাহিদা সাত-আট বছর ধরে প্রতি বছরই বাড়ছে। যেমন, ২০১১-১২ সালে দেশে এলপিজি আমদানি হতো এক লাখ মেট্রিক টন। এ বছর ১০ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ গত আট বছরের ব্যবধানে বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। তবে বাজার অনুযায়ি এখাতে কোম্পানি চলে এসেছে অনেক। পাশের দেশ ভারতে এলপিজি আমদানি করে মাত্র তিনটি কোম্পানি। সেখানে আমাদের দেশে ১৬-১৭টি কোম্পানি আমদানি করে। অর্থাৎ বাজার প্রচ-প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে। এছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামো। ভারত যেখানে ৪০ হাজার মেট্রিক টনের জাহাজ আনতে পারে, সেখানে বাংলাদেশে আনা যায় মাত্র আড়াই থেকে পাঁচ হাজার টনের জাহাজ। এতে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে ভোক্তাদের ওপর। ভারতের তুলনায় আমদানিতে আমাদের খরচ পড়ে প্রায় দ্বিগুণ। ভারতে এলপিজি ৪০ হাজার মেট্রিক টন আমদানিতে একটি জাহাজে প্রতি টনে খরচ পড়ে ৫০ থেকে ৬০ ডলার। আমাদের আড়াই থেকে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন আমদানিতে খরচ পড়ছে তার দ্বিগুণ। মূলত এলপিজির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য এবং ডলার রেট এর ওপর নির্ভরশীল। প্রতি মাসেই প্রায় বিশ্ববাজারে দাম ওঠা নামা করে। এ জন্য দেশের বাজার দাম স্থিতিশীল রাখা যায় না।

এলপিজির বিশ্ববাজার পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল নয়। গত ৬ মাস আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির মূল্য ৬০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের এলপিজি বাজার প্রায় পুরোটাই আমদানিনির্ভর, তাই বাজারে বর্তমানে একটি অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশে ৭৫ শতাংশ বাজার দখল করবে এলপিজি এমনই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। মানুষ এখন কাঠ-কয়লা দিয়ে রান্না করে। এতে শ্বাসকষ্টসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে হয়। বিশেষ করে নারীরা। অন্যদিকে জ্বালানি কাঠের জোগান দিতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এ জন্য এলপিজি একটি বিকল্প জ্বালানি হতে পারে।

> ভারতের তুলনায় আমদানিতে আমাদের খরচ পড়ে প্রায় দ্বিগুণ। ভারতে এলপিজি ৪০ হাজার মেট্রিক টন আমদানিতে একটি জাহাজে প্রতি টনে খরচ পড়ে ৫০ থেকে ৬০ ডলার। আমাদের আড়াই থেকে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন আমদানিতে খরচ পড়ছে তার দ্বিগুণ।

আগামী ১০ বছরে এ খাতে অনেক পরিবর্তন আসবে। আজকে যে কাঠের চুলায় রান্না করা হচ্ছে, কালকে সে চুলা থাকবে না। গ্রামে এখন অনেক বাসায় এলপিজি ব্যবহার হচ্ছে। কারণ তাদের আয় বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে।

এলপি গ্যাস ব্যবসার বড় চ্যালেঞ্জ পরিবহন ব্যবস্থা। পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এলপি গ্যাসের দাম বাড়ে। এলপিজির ব্যবহার বা ব্যবসা বাড়াতে অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও চীনে এলপিজি ব্যবহার বাড়ছে তাদের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে। এলপিজির ব্যবহার আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে। আগামী ১০ বছরে ৭০ শতাংশ আবাসিক গ্যাসের চাহিদা এলপিজি দিয়ে মেটানো সম্ভব। এ ছাড়াও বাজারে অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির উপস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজি মূল্যের অস্থিতিশীলতা এবং বে-আইনি ক্রস ফিলিং এলপিজি খাতের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

এলপিজি ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো আরেকটি চ্যালেঞ্জ। অধিকাংশ দুর্ঘটনা গ্রাহকের অবহেলার জন্য হয়। এর ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহককে জানতে হবে। এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এলপিজি সিলিন্ডার কখনো বিস্ফোরণ হয় না। এলপিজির ওপর গ্রাহকদের বিশ্বাস রাখা উচিত। নতুন করে যেসব বাড়ি তৈরি হয়; ওই সব বাসাবাড়িতে এলপিজি সিলিন্ডার রাখার জন্য নির্ধারিত জায়গা রাখা হয় না। ফলে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সিলিন্ডার যেনতেনভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যেসব স্থানে রাখা হয়; তাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকে না। এ জন্য বিল্ডিং কোডের একটা পরিবর্তন দরকার। এটা এলপিজি সিলিন্ডার রাখার জন্য সহায়ক হবে। নিরাপত্তা মান ধরে রাখার জন্য আবাসন খাতের সংগঠনগুলোকে উদ্যোগ নিতে হবে।

দুনিয়াব্যাপী যাত্রীবাহী গাড়ি এবং ভ্যানের জ্বালানি হিসেবে গ্যাসোলিন কিংবা ডিজেলের পরিবর্তে অটো গ্যাস ব্যাপক জনপ্রিয়। বিগত কয়েক বছর বিশ্বাবাজারে অটো গ্যাসের চাহিদা ক্রমশ স্থিতিশীল হারে বেড়ে চলেছে। কোনো কোনো দেশে অটো গ্যাস গাড়ির জ্বালানি বাজারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০ লাখ ৭০ হাজার টন অটো গ্যাসচালিত যানবাহন রয়েছে, ২০০০ সালের তুলনায় যার পরিমাণ প্রায় চার গুণ। বাংলাদেশে বিগত দুই বছরে অটো গ্যাস স্টেশনের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিনগুণ হয়েছে, যা এখনো বেড়ে চলেছে।

এলপিজি হচ্ছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস। এতে আগুনের দুর্ঘটনা ঘটছে। এর বেশিরভাগই অসচেনতার কারণে। আর ব্যবসায়ীদের ভুল ব্যবহারে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। প্রায়ই শোনা যায় গ্যাসের আগুন থেকে দুর্ঘটনার সংবাদ। তাই সিলিন্ডার ব্যবহারের সময় অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। এলপিজি বা সিলিন্ডারের গ্যাস আমাদের অনেকের বাড়িতেই ব্যবহার হয় রান্নার কাজে। প্রতিদিনের জীবনে অনেকের জন্যই এটি দরকারি। কিন্তু অসাবধানতার কারণে মাঝেমধ্যে এলপিজি সিলিন্ডারও হয়ে যেতে পারে ঝুঁকির কারণ।

এলপিজি সিলিন্ডারের গ্যাস লিক হতে পারে বিভিন্ন কারণে। হোস পাইপ, রেগুলেটর, গ্যাস ভাল্ব ইত্যাদি থেকে হতে পারে লিক। গ্যাস লিক হলেই বিপত্তি। এ গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়ার সময় যা যা করতে হবে তা হচ্ছে- ডেলিভারি নেয়ার সময় অবশ্যই সিলিন্ডারের মেয়াদ দেখতেই হবে। প্রতিষ্ঠানের সিল ও সেফটি ক্যাপ সিলিন্ডারে ঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে, সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যেনো সিলিন্ডার টানা, গড়ানো, ঘষা বা ফেলা না হয়।

ব্যবহারের আগে ও পরেও কিছু বিষয় জেনে রাখা জরুরি আর সেগুলো হচ্ছে- সিলিন্ডার সমান যায়গায় সোজাভাবে রাখতে হবে, রান্নাঘর খোলামেলা ও পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি ঘরের জানালা দরজা সবসময় খোলা রাখা জরুরি, রান্না ঘরের মধ্যে কোনো প্রকার দাহ্য পদার্থ রাখা যাবে না, প্লাস্টিক, কাগজ, কেরোসিন ও গ্যাস ভর্তি অন্য সিলিন্ডার সেখানে বর্জনীয়, সিলিন্ডার সবসময় ছায়া যুক্ত ঠান্ডা স্থানে রাখা উচিৎ, যেনো কোনো সময় তাপের সংস্পর্শে না আসে, গ্যাসের পাইপ অবশ্যই সময়মতো পরিবর্তন করা উচিত এবং সবসময় বিএনটিআই অনুমোদিত গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা উচিত। বিএসটিআই অনুমোদিত রেগুলেটর, পাইপ ইত্যাদি ক্রয় করা উচিত অনুমোদিত বিক্রেতার কাছ থেকে।

অসাবধানতাই সব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। গ্যাস সিলিন্ডারের দুর্ঘটনার কারণও একই। একটু সতর্ক থাকলেই এই বিপদ এড়িয়ে চলা সম্ভব। সবার উচিত সম্ভাব্য সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে নিয়ম অনুযায়ী গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।

শেখ নাওইদ রশিদ
হেড অব স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, জি-গ্যাস

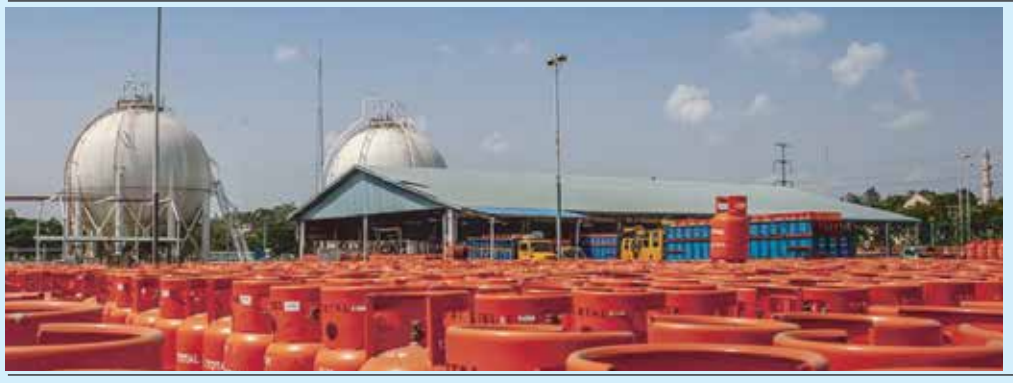

ইডকলকে শোকজ

ইডকলকে শোকজ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে প্রকল্প অর্থায়নের জন্য পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল দেশের ব্যাংকে এফডিআর রাখার প্রমাণ পাওয়ায় এই শোকজ।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শুক্রবার, ২৪শে মাঘ ১৪২৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০

পুঁজিবাজারে আসছে বিদ্যুতের পাঁচ কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদ্যুতের পাঁচ কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।

কোম্পানিগুলো হলো নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ ইজিসিবি লিমিটেড, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড, বি আর পাওয়ারজেন লি. এবং গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড জিটিসিএল।

এ ছাড়া তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ পিজিসিবি এর আরও শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে।

এসব কোম্পানির সম্পদের মূল্যায়ন করার পরে শেয়ারবাজারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী দু'মাসের মধ্যে কোম্পানির নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

কোম্পানিরই উদ্বৃতপত্র নিরীক্ষা করা হবে। সম্পদ মূল্যায়ন করার জন্য দুই মাস সময় দেয়া হয়েছে। এসব কোম্পানির ১০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অংশ প্রাথমিকভাবে শেয়ারবাজারে আনা হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারে আনতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এই সব কোম্পানি পুঁজিবাজারে আনা হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের শেয়ারবাজারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ দরকার। এখানে যারা আছে তারা বিক্ষিপ্তভাবে আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারবাজারে আসতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে পাঁচ কোম্পানিকে শিগগিরই শেয়ারবাজারে আনা হবে। তিনি বলেন, কোম্পানিগুলোকে দুই মাস সময় দেয়া হয়েছে। এই সময়ে তারা তাদের সম্পদের পরিমাণ যাচাই করে জানাবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাজারকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শেয়ারবাজারে নিয়ে আসা উচিত। শেয়ারবাজারকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডেসকোর সাধারণ সভায় চেয়ারম্যানসহ অন্যরা

ডেসকোর ১২ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন

১লা জানুয়ারি

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে। ৩০শে জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। এর পুরোটাই নগদ লভ্যাংশ।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ট্রাস্ট মিলনায়তনে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) করেছে ২ টাকা ৭৭ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ২৭ পয়সা।

ডেসকোর শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৪৬ টাকা ৩০ পয়সা। আগের বছরে যা ছিল ৪০ টাকা ১৩ পয়সা।

কোম্পানির চেয়ারম্যান মাকছুদা খাতুনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানি পরিচালক শহীদ সারোয়ার, বিকাশ দেওয়ান, জহিরুল হক, শাহনেওয়াজ আহম্মেদ, রুকন-উল-হাসান, আতাউল মাহমুদ, আনিসুর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম, স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আলাউদ্দিন, মো. হেলাল উদ্দিন, মো. রবিউল হাসনাত এবং কোম্পানি সচিব এসএম জামিল হোসেইনসহ অন্যরা।

অন্তবর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা: সামিটের লেনদেন বেড়েছে

২রা জানুয়ারি

অন্তর্বর্তীকালীন ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সামিট পাওয়ার।

এতে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সামিটের লেনদেনের দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে উঠে আসে। ২০০৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির পর প্রথমবারের মতো সামিট অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করল।

অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণায় সামিট পাওয়ারের প্রতি শেয়ারের দাম ঢাকার বাজারে দুই টাকা বেড়েছে। দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা ২০ পয়সা।

জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। কোম্পানির আর্থিক বছর শেষ হবে আগামী জুন মাসে।

গত ছয় মাসের আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামিটের আয় আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে দুই টাকা ৮৪ পয়সা।

আগের বছর ছিল দুই টাকা ৫৪ পয়সা। অর্থাৎ শেয়ার প্রতি আয় বেড়েছে ৩০ পয়সা।

সামিটের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করায় একদিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রায় ১৭ কোটি টাকার ৪১ লাখ শেয়ারের হাতবদল হয়।

সামিটের লভ্যাংশ ঘোষণায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১২ পয়েন্ট আর চট্টগ্রামে ৬৫ পয়েন্ট সূচক বেড়েছে।

১লা মার্চের মধ্যে সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখতে হবে : হাইকোর্ট

২০শে জানুয়ারি

১লা মার্চের মধ্যে প্রত্যেক এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের গায়ে দাম লিখতে হবে। একই সাথে সরকারকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে দাম নির্ধারণের নিয়ম করতে কমিটি গঠন করতে হবে।

হাইকোর্ট এই আদেশ দিয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও জ্বালানি সচিবকে এ নির্দেশনা পালন করতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপি গ্যাসের দাম বাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেশে কি হারে দাম বাড়বে তা নির্ধারণে একটি মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠনেরও নির্দেশনা দিয়েছে আদালত।

পাশাপাশি আগামী ১লা মার্চের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রগতি আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে।

আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন রিটকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান লিংকন। এর আগে, ১৩ই জানুয়ারি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনিরুজ্জামান। রিটে এলপিজি সিলিন্ডারের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লিখে দিতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এলপি গ্যাসের দাম বাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেশে কি হারে দাম বাড়বে তা নির্ধারণে একটি মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার আগেই আমদানি করা থাকলেও তার দাম বাড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বেড়েছে ১০০ থেকে ৫৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

১লা জানুয়ারি থেকে এলপি গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। সিলিন্ডার ভেদে গ্যাসের দাম সাড়ে ৫শ' টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম বাড়ায় এখানে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ঠরা। শুধু বেসরকারি সরবরাহকারি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে। হঠাৎ করেই এলপি গ্যাসের মূল্য ব"দ্ধির কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রেতারা।

চট্টগ্রামে সাড়ে ১২ কেজির এলপি গ্যাস বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ৫০ টাকায়। দুই মাস আগেও এর দাম ছিল ৮৫০ টাকা। খুলনায় ডিসেম্বরে ছিল ৯০০ টাকা নতুন বছর থেকে বিক্রি হচ্ছে এক হাজার একশ' টাকা।

রাজশাহীতে সাড়ে ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে এক হাজার ৫০ টাকা। ৩৫ কেজি সিলিন্ডার দুই হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই হাজার ৯০০ টাকা আর সাড়ে ৫ কেজির সিলিন্ডার ৪৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

সরবরাহকারিরা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে স্থানীয় বাজারেও বেড়েছে। কোম্পানিগুলোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভারতের এলপি গ্যাসের দাম বেড়েছে

ভারতে ভর্তুকিহীন এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। ১লা জানুয়ারি থেকে এই দাম কার্যকর হয়েছে। এলপিজি সরবরাহকারী ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ি, দিল্লি ও মুম্বইয়ে সিলিন্ডার পিছু দাম যথাক্রমে ১৯ রূপি এবং ১৯ রূপি ৫ পয়সা করে বেড়েছে। এতে ভর্তুকিহীন এলপিজির দাম দিল্লিতে সিলিন্ডার প্রতি বেড়ে হয়েছে ৭১৪ রূপি আর মুম্বইয়ে সিলিন্ডার প্রতি বেড়ে হয়েছে ৬৮৪ রূপি ৫০ পয়সা।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুযায়ি, ডিসেম্বর মাসে সিলিন্ডারের দাম ছিল যথাক্রমে ৬৯৫ রূপি ও ৬৬৫ রূপি। কলকাতা ও চেন্নাইতে ভর্তুকিহীন এলপিজির দাম সিলিন্ডার প্রতি যথাক্রমে ২১ রূপি ৫ পয়সা এবং ২০ রূপি করে বেড়েছে। সিলিন্ডার প্রতি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৭৪৭ রূপি ও ৭৩৪ রূপি।

এলপিজির দাম (প্রতি ১৪.২ কিলোগ্রাম) অগাস্টের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে সিলিন্ডার প্রতি ১৩৯.৫ টাকা এবং মুম্বইয়ের সিলিন্ডার প্রতি ১৩৮ টাকা করে বেড়েছে। এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৪.২৮ শতাংশ এবং ২৫.২৫ শতাংশ।

সরবরাহকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল প্রতিমাসে রান্নার গ্যাসের দাম পর্যালোচনা করে এবং দাম নির্ধারণ করে। একবছরে প্রতি পরিবারে ১৪.২ কিলোগ্রামের ১২টি সিলিন্ডারের ভর্তুকি দেয় সরকার। এর অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার কিনলে তা গ্রাহককে বাজার মূল্যেই কিনতে হয়।

ভারতের বিভিন্ন মহানগরীতে ভর্তুকিহীন এলপি গ্যাসের দাম (প্রতি ১৪.২ কেজি)

	জানুয়ারি	ডিসেম্বর
দিল্লি	৭১৪ রূপি	৬৯৫
কলকাতা	৭৪৭	৭২৫.৫
মুম্বাই	৬৮৪.৫০	৬৬৫
চেন্নাই	৭৩৪	৭১৪

সূত্র: ইন্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানি লি.

বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার যে ভুল করবেন না

বাংলাদেশে বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সচেতনতার মাধ্যমেই গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনা কমানো যায়। অল্প ভুলে বড় বিপদ হতে পারে। তাই যে ভুল করা যাবে না। রান্না শেষে চুলা ও এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটরের সুইচ খোলা রাখা যাবে না। অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

- ❑ সিলিন্ডার কোনোভাবেই চুলার অথবা আগুনের পাশে রাখা যাবে না। এতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
- ❑ রান্নার আগে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখা যাবে না। ঘরে গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত জানালা দরজা খুলে দিতে হবে।
- ❑ রান্না শুরু করার আধা ঘণ্টা আগে রান্নাঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন।
- ❑ গ্যাসের গন্ধ পেলে ম্যাচের কাঠি জ্বালাবেন না, ইলেকট্রিক সুইচ এবং মোবাইল ফোন অন বা অফ করবেন না।
- ❑ এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করতে হবে।
- ❑ চুলা থেকে যথেষ্ট দূরে, বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে এলপিজি সিলিন্ডার রাখতে হবে।
- ❑ রান্নাঘরের উপরে ও নিচে ভেন্টিলেটর রাখুন।
- ❑ রান্নার চুলা সিলিন্ডার থেকে নিচুতে রাখা যাবে না। কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখতে হবে।

বিইআরসিতে নতুন চেয়ারম্যান ও সদস্য

আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান

আবু ফারুক
সদস্য

মকবুল-ই-ইলাহী
সদস্য

বজলুর রহমান
সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) তে চেয়ারম্যানসহ নতুন তিনজন সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিআরসি'র নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন মো. আব্দুল জলিল। এছাড়া নতুন তিনজন সদস্য হয়েছেন, মোহাম্মদ আবু ফারুক, মো. মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী ও মোহাম্মদ বজলুর রহমান। আগের সদস্য মো. রহমান মুরশেদ এখনো কর্মরত আছেন।

আগের চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্যদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হলো। নতুন চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ইতিমধ্যে অফিস শুরু করেছেন।

পিডিবি'র চেয়ারম্যান জহুরুল হক

জহুরুল হক

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর নতুন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হয়েছেন মো. জহুরুল হক। তিনি বিউবো এর সদস্য প্রশাসন ছিলেন। জহুরুল হক ১৯৬৩ সালে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শে"ণিতে ১ম স্থান অধিকার করে এম.এসসি ডিগ্রী এবং ২০০০ সালে নোরাড ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় নরওয়ে থেকে এমফিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

জহুরুল হক ২০১৩ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে বিউবোতে কর্মরত। এর আগে তিনি নড়াইলের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি রেক্টর পদক এবং প্রশাসনের বিশেষ পদক অর্জন করেন।

ইডকলে চাকরির খবর

IDCOL
TOGETHER FOR TOMORROW

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) এ বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে।

চীফ অপারেটিং অফিসার: একজন। ন্যূনতম স্নাতক, ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা

ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ফাইন্যান্স): একজন। সিএসহ ন্যূনতম স্নাতক

সিনিয়র অফিসার (আইটি): একজন। বিএসসি (কম্পিউটার)

ম্যানেজমেন্ট টে"নি: দুইজন। ন্যূনতম স্নাতক

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং (পরিবেশ): একজন। ন্যূনতম স্নাতক

স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট: একজন। ন্যূনতম স্নাতক।

২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে।

বিস্তারিত:
htt://idcol.org/home/vacancids

চিত্রে এফইআরবি এর এনার্জি নাইট

ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স, বাংলাদেশ এর এনার্জি নাইট হয়ে গেল। রাজধানীর কন্টিনেন্টাল হোটেলে ২৩শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠানে ফোরামের সদস্য ছাড়াও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মিলন ছাড়াও ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছবিতে বাঁ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বদরুল ইমাম, এনার্জি প্যাকের চেয়ারম্যান হুমায়ুন রশীদ, পিডিবি'র সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ম তামিম, সাবেক বিদ্যুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক ই ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এফইআরবি'র চেয়ারম্যান অরুণ কর্মকার, এফইআরবি'র নির্বাহী পরিচালক সদরুল হাসান, সামিট গাজিপুর-২ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হোসেন ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার। ছবি: সুবীর কুমার

এনার্জি নাইটে নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা ▶

এনার্জি নাইটে গান পরিবেশন করছেন শিল্পী ▼

এনার্জি নাইটে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও বিদুৎ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর সাথে এফইআরবি সদস্যরা। ▶

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী-
'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে আমাদের লক্ষ্য:

১. ''মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ'' হিসেবে পালন; ২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা;
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে 'আলোর ফেরিওয়ালা' কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের 'উঠান বৈঠক' জোরদার করা;
৫. 'আমার গ্রাম – আমার শহর' বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা;
৬. ''দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'' নীতি জোরদার করা;
৭. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে 'পেপারলেস অফিস' চালু করা;
৮. 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা;
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

৫ বছরে বিদ্যুতের তার মাটির নিচে

৫ই জানুয়ারি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, দেশের সব শহরে ৫ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করা হবে।

রাজধানীতে বিদ্যুৎ ভবনে আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনে পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি সই অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানি কেআইএস গ্রুপ এবিষয়ে চুক্তি করেছে।

সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ শহরে বিতরণ ব্যবস্থা মাটির নিচে নেয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই, আর্থিক প্রাক্কলন ও প্রকল্প প্রস্তুত করতে পরামর্শ দেবে এই কোম্পানি। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ২৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এক বছরের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে তারা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরে বিদ্যুতের তারের জন্য সব গাছের গলা কেটে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা করা যাবে না। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয়। বিদ্যুতের তার ভূ অভ্যন্তরে নিতে হবে।

সরকার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে চায় জানিয়ে তিনি বলেন, এক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ যাতে না যায় সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার চায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ শহরকে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের আওতায় আনা হবে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশের শহরাঞ্চলে বিতরণ ব্যবস্থা মাটির নিচে নেয়া হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব সুলতান আহমেদ বলেন, দৃশ্যমান দূষণ রোধ করবে এই প্রকল্প। এতে করে দৃষ্টিনন্দন হবে শহর।

এনার্জি বাংলা
ঢাকা, শুক্রবার, ২৪শে মাঘ ১৪২৬, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিপিসি : সক্ষমতা থাকলেও এলপিজি উৎপাদন কম

বিশেষ প্রতিনিধি

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস কোম্পানির সক্ষমতার অনেক কম উৎপাদন করছে। আবার এই কোম্পানির কাঁচামাল আমদানিরও কোনো সুযোগ নেই। ফলে বাজার ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইস্টার্ন রিফাইনারি ও পেট্রোবাংলার অন্য গ্যাস ক্ষেত্র থেকে কাঁচামাল নিয়ে তারা বটলিং করে।

দুই কেন্দ্রে বছরে ৩০ হাজার টন উৎপাদন করতে পারলেও গড়ে করছে ২০ হাজার টন।

বেসরকারি কোম্পানির চেয়ে দাম কিছুটা কম হওয়ায় বাজারে বিপিসির এলপি গ্যাসের চাহিদা বেশি। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান বাড়ানো গেলে সরকারিভাবে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

এলপি গ্যাসের চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা এবং সিলেটের গোলাপগঞ্জ কৈলাশটিলায় এলপিজি বটলিং কেন্দ্র আছে। ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) এবং রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডে (আরপিজিসিএল) উৎপাদিত এলপিজি পাইপ লাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মজুদ করা হয়। তারপর বোতলজাত করে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে বাজারজাত করে। নির্ধারিত দামেই বিক্রি করে।

এলপি গ্যাস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুর রহমান খান এনার্জি বাংলাকে বলেন, কাঁচামাল বাড়ানো গেলে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর উপায় নেই। আমাদের আমদানি করার সুযোগ নেই। স্থানীয়ভাবে যতটুকু কাঁচামাল পাই তা দিয়ে উৎপাদন করি। আমদানি করতে গেলে এলপিজি টার্মিনাল দরকার। আমাদের টার্মিনাল নেই। টার্মিনাল করার জন্য যে জায়গা লাগবে, তা চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মাতারবাড়ীতে টার্মিনাল করার উদ্যোগ নিয়েছে বিপিসি। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উৎপাদিত সব এলপিজি বোতলজাত ও বিতরণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য এলপিজি আমদানি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তা হলে গৃহস্থালি জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে আশা করি।

সূত্র জানায়, চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল জোগান দেয়া হচ্ছে না। যান্ত্রিক ত্রুটি ও মেরামতের নামে ঘনঘন উৎপাদন বন্ধ রাখা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাংলাদেশ এলপি গ্যাস কোম্পানি লাভজনক ছিল। উৎপাদন কমায় এখন লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। আয়-ব্যয়ে সমন্বয় হচ্ছে না। ২০১৫-১৬ ও ১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৯০ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। আবার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সাড়ে ১৬ লাখ টাকা লাভ করেছে।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দাবি করেন, সক্ষমতার চেয়ে উৎপাদন কম হচ্ছে না। তবে মাঝে মধ্যে ত্রুটির কারণে উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এতে গড়ে হিসাব করলে উৎপাদন কম মনে হচ্ছে। নতুন ইউনিট বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ঠরা জানিয়েছেন, নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত না থাকায় বিপিসির এলপি গ্যাস বাজার হারাচ্ছে। সুবিধাভোগী দুষ্টচক্র প্রতিষ্ঠানটিকে জিম্মি করে রেখেছে। অধিকাংশ সিলিন্ডার জরাজীর্ণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এতে নিত্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। চাহিদা থাকলেও নতুন সিলিন্ডার আমদানি করা হচ্ছে না। সিলিন্ডারের ভাল্ব, টপ রিং-ফুট রিং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

বিপিসির ৪ লাখ ৩২ হাজার সিলিন্ডার আছে। এর মধ্যে ২৩ হাজার ৪৫৫টি সিলিন্ডার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৯ হাজার ২৯টি পুরনো সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার সিলিন্ডার বাজেয়াপ্তের জন্য আবেদন প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া সিলিন্ডারের ঘাটতি মেটানোর জন্য ইতিমধ্যে ৩৫ হাজার আমদানি করে গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

ঝুঁকি: অন্য আর পাঁচটা পণ্যের মতই সাধারণভাবে বিক্রি হচ্ছে এলপিজি। যেন দেখার কেউ নেই। রাজধানী মধুবাগের একটি দোকান থেকে তোলা। ছবি: এনার্জি বাংলা

ডিজেল সঙ্কট নেই: ভারত থেকে আমদানির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে এই মুহূর্তে ডিজেলের কোন সংকট নেই। কৃষি সেচ মৌসুমের প্রয়োজনীয় তেল মজুদ আছে। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় তেল আমদানি প্রক্রিয়ায় আছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান সামছুর রহমান বলেন, এই মুহূর্তে দেশে ডিজেলের কোনো সঙ্কট নেই। যথেষ্ট মজুদ আছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে মোট মজুদ গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচ লাখ ১৯ হাজার টনে। যা চাহিদার চেয়ে বেশি।

ভারত থেকে আসবে ৬০ হাজার টন ডিজেল

ভারত থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলতি বছর ৬০ হাজার টন ডিজেল আমদানি করা হবে। এতে খরচ হবে ৩১৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এ সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) থেকে পার্বতীপুর ডিপোতে রেল ওয়াগনের মাধ্যমে ডিজেল আমদানি করবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। জানুয়ারি থেকে আগামী জুন পর্যন্ত সময়ে বিপিসি ৩০ হাজার টন ডিজেল আমদানি করবে। আগামীতে জুলাই থেকে ডিসেম্বরের জন্য আরও ৩০ হাজার টন ডিজেল আমদানি করবে। এক্ষেত্রে প্রতি ব্যারেলের প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৫ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার।

উপদেষ্টা সম্পাদক : **অরুণ কর্মকার** সম্পাদক ও প্রকাশক : **রফিকুল বাসার** এনার্জি বাংলা অনলাইন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **সাগর সরওয়ার**
এনার্জি বাংলা, শতাব্দী সেন্টার, ২৯২, ইনার সার্কুলার রোড, স্যুট # ১০-এফ, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এবং **মাহির প্রিন্টার্স** ফকিরেরপুল থেকে ছাপানো
সম্পাদকীয় কার্যালয় : ২/৩-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : +৮৮ ০২ ৯৫৫৯২৩২, +৮৮ ০১৫৫২ ৩১৫৭৪৫
ই-মেইল : energybanglabd@gmail.com, www.energybangla.com, www.energybangla.com.bd